চামড়া শিল্পে সংকট...

রপ্তানিজাত শিল্পের মধ্যে চামড়া অন্যতম। চামড়া শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে কি না করছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। এত বছরেও চামড়া শিল্পের জন্য কোনো নীতিমালা তৈরি হয়নি। এ শিল্পকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারি উদ্যোগ কাগজ কলমেই রয়ে গেছে। ফলে সংকট গভীরতর হচ্ছে দিন দিন... লিখেছেন **জাকির হোসেন**

ছবি : **এন্ড্রু বিরাজ**

আপনার পায়ের সুন্দর চকচকে জুতো, পকেটের মানিব্যাগ, কোমরের বেল্ট, কাঁধের ব্যাগ, এমনকি হাতঘড়ির বেল্টটিও বিদেশী মোড়কে চকচকে চামড়ার তৈরি। মেইড ইন ইটালি, চায়না, জাপান, ফ্রান্স লেখা দেখে আপনি আস্থা পাচ্ছেন পণ্যটি ভালোমানের চামড়া দিয়ে তৈরি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না ভালোমানের চামড়াটি দূরের কোনো রাষ্ট্রের নয়, হতে পারে আপনি কোরবানির ঈদে যে পশুটি কোরবানি দিয়েছেন সে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। বিষয়টি অমূলক কিছু নয়। আমাদের দেশ থেকে বছরে হাজার কোটি টাকার চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে চামড়া সেক্টর থেকে আয় হয়েছে ১৬২৪ কোটি টাকা। ট্যানারি মালিকদের মতে, সরকারের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই চামড়া শিল্প হতে পারে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য, যা থেকে আমরা পেতে পারি পাঁচ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি আয়।

দেশের সবচেয়ে বড় পরিবেশ দূষণ সংঘটিত হচ্ছে চামড়া শিল্পের মাধ্যমে। কিন্তু এই চামড়া শিল্প দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী রপ্তানিমুখী শিল্প।

ইটালি, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, হংকং, জার্মানি, ব্রাজিলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চামড়া রপ্তানি হচ্ছে। এশিল্পের সঙ্গে জড়িতে আছে প্রায় ৬৫ হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী ও শ্রমিক কিন্তু সুস্থ ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতির অভাবে দেশে চামড়া শিল্পের ধস নামছে।

বিশ্ববাজার ধরার প্রক্রিয়ায় কাচা চামড়া

দেশ বঞ্চিত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা থেকে।

সংকটের আবর্তে চামড়া শিল্প

সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছাড়াই চামড়া শিল্প দেশের ১০০ ভাগ রপ্তানি শিল্প। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ খাতকে সঠিক নিয়মনীতির আওতায় আনা হয়নি। প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থা না নেয়া, উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ-সুবিধা অভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোর সঠিক ভূমিকার অভাব, অদক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা, ঋণের ওপর উচ্চহারে সুদ ও দন্ড সুদ আরোপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা এবং সিদ্ধান্ত সমন্বয়ের অভাব, উন্নত প্রযুক্তির অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অসম প্রতিযোগিতা, শুল্ক কর্তৃপক্ষের হয়রানি, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়া ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানি বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি কারণে চামড়া শিল্প আজ চরম দুর্দশার মধ্যে আছে।

এ শিল্পে এতো সমস্যার আস্তরণের মুখে সম্প্রতি টুইন টাওয়ারে বিমান হামলার ফলে বিশ্ব অর্থনীতির ছোঁয়াও লেগেছে আমাদের চামড়া শিল্পে। ফলে বিপাকে পড়েছে ট্যানারি মালিকেরা।

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আব্দুল হাই সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, চমড়া শিল্পের নানা সংকট এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে দেশের ১০০% রপ্তানি পণ্যের আজ খুবই নাজুক অবস্থা। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে সবার আগে দেশের চামড়া শিল্পের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। যা আমরা এখনও পাইনি।

বাংলাদেশে প্রায় সারে তিনশ' চামড়া কারখানা থেকে বছরে ২০ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপন্ন হয়। সারা বছর যে চামড়া উৎপাদন হয় তার ৪০-৪৫ ভাগই উৎপাদন হয় কোরবানির ঈদে। এ সময়টা চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি হাজারীবাগ ট্যানারি এলাকা পরিদর্শনে দেখা গেছে সে রকমই একটি দৃশ্য।

সমস্যার বিষয়টি জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানান, চামড়া আমাদের অন্যতম রপ্তানি পণ্য হলেও আমরা সরকারের সুনজর পাইনি। আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণ চামড়া শিল্পে দেয়া হচ্ছে না। উপরন্ত ঋণের ওপর ১০% হারে সুদ নেয়া হচ্ছে যা ব্যবসায়ীদের জন্য পূর্ণ। এবছর কোরবানির আগে ৫টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক মাত্র ১৫০ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেছে। অথচ এ সময়ে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকার চামড়া আমদানি হয়। চামড়া ব্যবসায়ীরা জানায়, ব্যাংক ঋণ পেলেও উচ্চহারে সুদ দেয়ার ফলে অনেক ক্ষুদ্র ট্যানারি বন্ধ হয়ে গেছে। জানা যায়, আমেরিকা-আফগান যুদ্ধের ফলে ইতিমধ্যে চামড়ার মূল্য ২৫% থেকে ৩০% হ্রাস পেয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে বিমান ও জাহাজ ভাড়া বেড়ে গেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ অতিরিক্ত ওয়্যার সারচার্জ।

পূতি গন্ধময় দূষিত পরিবেশে হাজারিবাগ ট্যানারী এলাকা

এবছর চামড়া শিল্পে আরও একটি সমস্যা জড়িয়েছে 'সালফিউরিক এসিড' সংকট। দেশে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেড়ে যাবার প্রেক্ষাপটে সরকার ৬টি প্রয়োজনীয় এসিডসহ সকল প্রকার এসিড ব্যবহার, আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, মজুদ, পাইকারি ও খুচরা বিক্রি এবং প্রদর্শনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার মাদক অধিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। চামড়া ব্যবসায়ীদের বক্তব্য হচ্ছে, 'আমরা এ এসিড ৫০ বছর ধরে ববহার করে আসছি। হাজারীবাগ এলাকায় কখনও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেনি। আমাদের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সব ধরনের লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও নতুন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহণ করবো কেন?'

সরকারের এসিড ব্যবহার নিষেধাজ্ঞার ফলে হুট করে এসিডের দাম বেড়ে গেছে। প্রতি স্কয়ার ফিট চামড়ার এসিড ব্যবহারের খরচ পড়ত ১ টাকা, সেখানে এখন ১০ টাকা খরচ পড়ছে। সরকারের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘোষণার ফলে এসিড ডিলাররাই শুধু লাভবান হচ্ছে। এসিড ব্যবসায়ী সমিতির মতে, তারা ১৯১৯ সালের পয়জন অ্যাক্ট অনুযায়ী লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে। নতুন করে লাইসেন্স কেন নেবে? এ ছাড়া ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স নিলেও লাভ নেই। কারণ ব্যবহারকারীর মাদকের লাইসেন্স নেই। সুতরাং বিক্রি করা যাবে না। তাছাড়া চামড়ায় ব্যবহৃত এসিড মাদক দ্রব্যের আওতায় পড়ে না।

এসিড সংকটে চামড়া শিল্পের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছে। কারণ চামড়া প্রক্রিয়াজাত করণের জন্য এসিড একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রথমে লবণ পরে চুন মেশানো হয়। প্রক্রিয়াজাত করনের তৃতীয় ধাপে দেয়া হয় সালফিউরিক এসিড। যা চামড়া থেকে লোম ছাড়ানোর কাজ করে। কিন্তু এসিডের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া। সরকারি নিষেধজ্ঞার পর এসিড ব্যবসায়ীরা মাল স্টক করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনও অনেক চামড়া ব্যবসায়ী এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স গ্রহণ করেনি, তাই কোরবানির চামড়া নিয়ে বড় ধরনের সমস্যায় পড়ছে ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা জানায়, আমাদের দেশে কেমিক্যাল কারখানা নেই। আমদানি করা কেমিক্যালের ওপর চলতে হয়। এছাড়া বিশ্বের সব দেশই এক্সপোর্টের ওপর ইনসেনটিভ পায়, আমরা তা পাই না। যা চামড়া সংকটের অন্যতম একটি বিষয়।

চামড়া শিল্পে বিগত তিন বছর ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক হারে চামড়া মূল্য হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যাংকের উচ্চ হারে সুদ, দন্ড সুদ, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল প্রদানসহ অন্যান্য ব্যয় এসব খাতে বেড়ে যাওয়ার জন্য চামড়া শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে। চামড়া শিল্পের নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর চামড়া রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে ঠিকই কিন্তু বিদেশে বাজার দর কমে যাওয়ায় আয় কমে যাচ্ছে। চামড় ব্যবসায়ীদের মতে,

কাচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে খরচ বাড়ছে দিন দিন

আন্তর্জাতিক বাজার দর কমে গেছে পাশাপাশি দেশীয় খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়ছে।

১৯৯০ সালে ১ জুলাই থেকে ওয়েট ব্লু রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও চামড়া শিল্পের সংকট সৃষ্টি করেছে। ট্যানারি মালিকদের একটি অংশ ওয়েট ব্লু প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকরণ বন্ধের জন্য দাবি তোলে। তারা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ চায় ট্যানারিগুলোকে আধুনিকরণের জন্য। ওয়েব ব্লু রপ্তানি বন্ধ করে ক্র্যাম ও ফিনিশ চামড়া রপ্তানির দাবি তোলে। বড়বড় ট্যানারিরর মালিকেরা এ দাবির সমর্থন করে। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ওয়েট ব্লু চামড়া উৎপাদন ৯০ সালের শেষ দিকে প্রায় দেরশ' ট্যানারি বন্ধ হয়ে যায়।

সীমান্ত পথ দিয়ে প্রায় ৭০% চামড়া পাচার হচ্ছে। এররা রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত। অনেক ট্যানারি মালিক রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক থেকে প্রচুর অর্থ ঋণ নিয়েছে। যা ফেরত দেয়াতো দূরের কথা, ব্যবসায় না খাঁটিয়ে ঋণের টাকায় বাড়ি গাড়ি করেছে। ফলে চামড়া ব্যবসায়ীদের ওপর ব্যাংকের আস্থা কমে গেছে। সরকার ও তাই উক্ত হারে সুদ নিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক জরিপে বলা হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ট্যানারির কাছ থেকে প্রায় ৭শ' কোটি টাকা ঋণ পাবে।

অস্বাভাবিক দূষিত পরিবেশে এখনো চলছে আমাদের ট্যানারি কারখানা

রাজনৈতিক প্রভাবের বদৌলতেই এ এলাকার ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাঁদাবাজী মাস্তানী ঘটে মাঠ পর্যায়ের ক্রেতাদের সঙ্গে। যেটা ফ্যাকটোরী পর্যন্ত অনেক সময়ই আসেনা। ঝুট ব্যবসার দন্দ্ব চলে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে। বগত সরকারের আমলে এলাকার ঝুট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থকদের হাতে। যার হর্তা কর্তা ছিলেন হাজী সেলিম। বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর এ ব্যবসার নিয়ন্ত্রন চলে গেছে বিএনপি'র সমর্থকদের হাতে। যা নিয়ন্ত্রন করছেন বর্তমান সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু। গত ডিসেম্বর মাসে এ ঝুট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পিন্টুর সঙ্গে এক অভ্যান্তরীণ দ্বন্দ্বের জোর ধরে গ্রেপ্তার হয়েছে লেদার

ইমারজেন্সী
জন্ম নিরোধক ট্যাবলেট

পোস্টিনর-২®

লিভোনরজেস্ট্রিল
০.৭৫ মিলিগ্রাম

ঘটনা যখন মহিলাদের হঠাৎ করে ঝামেলায় ফেলে দেয়

- আকস্মিক যৌনমিলন
- কনডম ফেটে যাওয়া
- ডায়াফ্রামের স্থানচ্যুতি
- নিরাপদ কাল নিরুপনে ত্রুটি
- পিল খেতে ভুলে যাওয়া
- শুক্রস্খলনের পূর্বক্ষনে বিচ্ছিন্ন হতে ব্যর্থতা
- ধর্ষণ

তখন মিলনোত্তর অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ প্রতিহত করে

পোস্টিনর-২®
সফলভাবে, নিরাপদে...

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত সেবনের পিল নয়

সতর্কতাঃ
গর্ভাবস্থায় খাওয়ার বিধান নেই
স্তন্যদায়ী মাতাদের সেবনে বাধা নেই

মাত্রা নির্দেশঃ
যৌনমিলনের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ১ ট্যাবলেট এবং ১২ ঘন্টা পর পুনরায় ১ ট্যাবলেট

শীঘ্র যত ভাল তত

প্রস্তুত কারক ঃ
গেডিয়ন রিকটার লিঃ
বুদাপেষ্ট, হাঙ্গেরী

বিশদ তথ্যের জন্য ঃ
মেডিমপেক্স প্রমোশন অফিস
২০, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৯৪

Universal

লিটন। লিটন লেদার পেকনোলজি কলেজের টেন্ডারবাজী করতো। এন এ এলাকার একচ্ছত্র আধিপত্র পিন্টুর হাতে। তবে চামড়া ব্যবসায়ীরা বলেছেন, টেন্ডারবাজী নিয়ে গন্ডগোল আমাদের ব্যবসায় প্রভাব ফেলে না।

ট্যানারি স্থানান্তর

ট্যানারি স্থানান্তরের বিষয়ে সরকার এবং ট্যানারি মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে ১৩ বছর ধরে। সকলের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য তা হয়ে উঠছে না। চামড়া শিল্প ছোট্ট পরিসরে গড়ে উঠেছিল নারায়ণগঞ্জ। ৫০ বছর আগে তৎকালীন সরকার এক আদেশ বলে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে তা ঢাকার হাজারী বাগে স্থানান্তর করে। ঢাকার পরিধি ছোট থাকায় এবং নদীর পাশে হওয়ায় এই স্থানটি চামড়া শিল্পের জন্য উপযুক্তই ছিল। ট্যানারির সংখ্যাও তখন ছিল হাতে গোনা কয়েকটি। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তিসহ ট্যানারি শিল্পের বিকাশ এবং জনবসতি বৃদ্ধির ফলে হাজারী বাগ হয়ে ওঠে চরম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ট্যানারি থেকে প্রতিনিয়ত নিগত হাইড্রোজেন, সালফাইড, এমোনিয়াম, ক্লোরিনও নাইট্রোজেন গ্যাস এর জন্য হাজারীবাগ হয়ে উঠেছে সবচেয়ে দূষিত পরিবেশের এলাকা। ট্যানারিগুলো থেকে প্রতিদিন ১৯ হাজার ঘন মিঠার বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত পানি বের হচ্ছে। যা গিয়ে মিশছে বুড়িগঙ্গা নদীতে। ফলে বুড়িগঙ্গা নদীর পানি হয়েছে চরম বিষাক্ত। হাজারীবাগ এলাকার শামিম আল-আমিন ২০০০কে জানায়, বাপ-দাদার পৈতৃক বাড়ি বলে এখনও এই এলাকায় মাথা গুঁজতে আসি। তবে দুর্গন্ধের মাঝে ছোট থেকে বেড়ে উঠেছি বলে এসব পচা গন্ধ কিছুটা সহনীয় হয়ে গেছে। সমস্যা হচ্ছে বাইরের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে। তারা পারতপক্ষে এ এলাকায় ঢুকতে চায় না।

মূলত ট্যানারি স্থানান্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরিবেশগত কারণে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশুদ্ধ পরিবেশ আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ এবং জরিপে ট্যানারি দূষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মহল ট্যানারি শিল্পের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকে গুরুত্ব দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তাই ট্যানারি স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। ২০০৫ সালের মধ্যে ট্যানারি শিল্পের এই পরিবেশ দূষণ রোধ করা না গেলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থার চাপে পড়বে। এর ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে পারে।

গত ১৩ বছরে তিনবার হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই উদ্যোগের সঙ্গে অর্থের যোগান ছিল না বলে তা বাস্তবায়ন হয়নি।

এই চামড়াই আমাদের এক'শ ভাগ রপ্তানিমুখি শিল্প

১৯৮৮-৯০ অর্থবছরে এরশাদ সরকারের আমলে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তর করে সাভার অথবা নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবার আগেই সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়ার সরকারের সময় সাভারের চন্দ্রা নারায়ণপুর এবং কেরানীগঞ্জে ট্যানারি স্থানান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সে লক্ষ্যে ৩০০ বাণিজ্যিক প্লটের জন্য ৬০০০ একর জমি এবং ২১৯ কোটি টাকার খরচের হিসাব করা হয়। কিন্তু এই খরচের হিসাবে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ব্যয় বাদ পড়ে যায়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বাণিজ্যিক নগরী গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং কিছু কাজও শুরু করেছিল। কিন্তু সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আর্থিক সহায়তার অভাবে প্রকল্পটি এগুতে পারেনি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ শাসনামলের সরকার হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের বিষয়ে একমত ছিল। কিন্তু এ শিল্পের স্থানান্তরের আর্থিক বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার ট্যানারি এলাকা পরিবেশ দূষণ কিভাবে কমানো যায় তার ওপর জোর দেয়। সে লক্ষ্যে UNIDO কে কাজ করার জন্য ও বলেন। UNIDO পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য কিছুপ্লেট ও স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাতেও বাধসাধে আর্থিক সহায়তা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতার আসার পর ১১ নবেম্বর ২০০১ বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ ফিনিসড লেদার, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টস এসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে ট্যানারি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্থানান্তরের বিষয়টি অবহিত করেন। প্রধানমন্ত্রী ট্যানারি স্থানান্তরের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত সরকারি তরফ থেকে নেয়া হয়নি। এসোসিয়শনের সদস্যরা মনে করে ট্যানারি এরাকার সুস্থ্য পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের কোনো বিকল্প নাই।

হাজারী বাগ থেকে ট্যানারি স্থানান্তরের জন্য প্রয়োজন ৭ হাজার একর জমি এবং ৩০০ কোটি টাকা। চামড়া ব্যবসায়ীরা সাভার ও নারায়ণগঞ্জে জমির খোঁজ সরকারকে দিয়েছে। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণের জন্য অর্থ সরকারকে খুঁজতে হবে। তা না হলে আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংস্থার চাপে পড়বে বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প।

দেশের চামড়া শিল্প অত্যন্ত লাভজনক একটি শিল্প। এ শিল্পের প্রতিকূলতা দূর করে চামড়া শিল্পকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে চামড়ার চাহিদা রয়েছে বিশ্ববাজারে। সুতরাং সরকারের সদিচ্ছা এবং সুনজর এ শিল্পকে বিশ্বে চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারবে।

চামড়া শিল্প থেকে বাংলাদেশের আয়

(১৯৭২-২০০১)

বছর	টাকা (কোটিতে)
১৯৭২-৭৩	১২.৬০
১৯৭৫-৭৬	৪৪.৮৪
১৯৮০-৮১	৯২.৬৪
১৯৮৫-৮৬	১৮০.২৪
১৯৯০-৯১	৪৭৪.৫১
১৯৯৫-৯৬	৯৮৬.৩১
১৯৯৯-২০০০	১০১৯.৩০
২০০০-২০০১	১৬২৪.০০

*সূত্র: **রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো***